মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এ দেশে কখনোই নয়

সুলতান আহমদ ঃ মাঝেমধ্যে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এই দুটো বিষয় বিভিন্ন জনসভা, আলোচনা সভা ও সেমিনারে উত্থাপিত হচ্ছে। এসব বক্তব্য সংবাদপত্রে বড় হরফে ছাপা হয়। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি এই কথাগুলো যারা মুসলমান, কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান একনিষ্ঠভাবে মেনে ও পালন করে জীবনযাপন করেন, তাদের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা হয়। পশ্চিমাবিশ্বে সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই শব্দ দু'টি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এই নিন্দাসূচক শব্দ দুটোর সাথে ইসলাম ধর্ম অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ধর্মান্ধতা, কূপণ্ডূকতা, ধর্মের নামে বাড়াবাড়ির ঘোরবিরোধী। ইসলাম কারো ওপরে কোন মত বা বিধান চাপিয়ে দেয় না। যদি কেউ এটা করে সে ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করে।

ইসলাম একটি উন্মুক্ত ধর্ম। আসুন, শিখুন, পাঠ করুন, বুঝুন, গ্রহণ করুন, পালন করুন। যে কোন ধর্ম, বর্ণ বা গোত্রের যে কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি যদি শিক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যক্তি হন তাহলে তার ইমামতিতে নামাজ আদায় করতে কোন মুসলমানের আপত্তি থাকে না। কিন্তু অন্য ধর্মের কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলে তাকে পুরোহিতের মর্যাদা দেয়া হবে না।

এই সমাজের দেহে সাম্প্রদায়িকতার নামে যে ক্ষতটি চলমান জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে তা বহু জাতি ও গোত্রভিত্তিক হিন্দু সমাজ থেকে সৃষ্ট।

আর্যরা মধ্যপ্রাচ্যের কোন অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে আসেন। সে সময় এই উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সমাজ, সংস্কার ও ভাষার লোকেরা বসবাস করতেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও শক্তিতে বলিয়ান আর্যরা ভারতবর্ষের আদি মানুষগুলোকে অনার্য নামে আখ্যায়িত করে সমাজে পতিত করে রাখেন। ক্রীতদাস ও দাসী হিসেবে তাদের ব্যবহার করতে থাকেন। এভাবে ভারতে বহু জাতিভেদের সূত্রপাত হয়। বহু জাতিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যরা অনার্যদের একটি অংশকে ম্লেচ্ছ বা অচ্ছুৎ হিসেবে সমাজে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এই অবস্থা এখনও বিদ্যমান। মাদ্রাজে এমন অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের মানুষ আছেন যারা অচ্ছুৎ। অর্থাৎ যাদের ছোঁয়া নিষেধ। ঘরের বাইরে এলে এরা গলায় ঘণ্টি বেঁধে বের হন। ঘণ্টি বাজতে থাকে আর জোরে জোরে তিনি বলতে থাকেন 'মায় আচ্ছুৎ হু'। মায় আচ্ছুৎ হু, হট যাও, হট যাও। অর্থাৎ দূরে সরে যাও- আমি অস্পৃশ্য। অচ্ছুৎদের ছায়া মাড়ানোও ব্রাহ্মণদের জন্য মহাপাপ।

বছর পঁচিশেক আগে বিহারের গ্রামাঞ্চলের একটি স্কুলে অস্পৃশ্য সমাজের একটি মেয়ে পড়ত। এই স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণ। বার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর স্কুল কয়েক দিন ছুটি থাকে। ব্রিটিশ আমল থেকে এখনও আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা বহাল আছে। এ উপলক্ষে অনেক স্কুলে ছোট-খাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অস্পৃশ্য সমাজের ঐ মেয়েটি সহপাঠীদের দেখাদেখি শিক্ষককে (ক্লাস টিচার) দেয়ার জন্য একটি ফুলের মালা গেঁথে এনেছিল। মালা দেয়া শুরু হলে ঐ মেয়েটিও সরল মনে শিক্ষকের গলায় তার সযতনে গাঁথা মালাটি পরিয়ে দেয়। আর যায় কোথায়। পড়ে গেল হৈ চৈ। ব্রাহ্মণ ঐ শিক্ষকটির জাত, কুল, মান সব গেছে। অচ্ছুৎ বালিকা তার গলায় মালা পরিয়েছে, সর্বনাশ! নরকবাস। মেয়েটিকে শিক্ষকরা বসতে বললেন। অনুষ্ঠান শেষে স্কুল কয়েক দিনের জন্য ছুটি হয়ে গেল। মেয়েরা যার যার বাড়ী চলে গেল। সন্ধ্যে হয়ে যায় কিন্তু ঐ মেয়েটি ঘরে ফেরে না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা অনুসন্ধানে বের হলেন। কয়েকজন শিক্ষক বললেন, ছুটির পর সে তো বাড়ী চলে গেছে। কিন্তু কই সে তো বাড়ী ফেরেনি। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দিন যায়। একদিন- দু'দিন- কয়েক দিন— স্কুলের সামনের মাঠে ছেলেরা বল খেলছিল। অদূরে একটি পরিত্যক্ত পাতকুয়া। বল গিয়ে পড়ল ঐ পাতকুয়ার মধ্যে। ছেলেরা ছুটে গেল কুয়ার কাছে। কুয়ার ভিতর থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। নিশ্চয়ই শিয়াল বা কুকুর পড়ে মরে পচেছে। আশপাশের লোকেরা দড়ি কাঁটা নিয়ে এল। অনেক

চেষ্টার পর দড়ির কাঁটায় উঠে এল একটি বালিকার গলিত লাশ। এ ওই বালিকার লাশ, যে নিখোঁজ হয়েছিল। মহা পাপের ফল নরকবাস থেকে রক্ষা পেতে তাকে কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অন্ধ বিশ্বাস থেকেই এই নির্মম হত্যাকাণ্ড।

এই তো দু'তিন বছর আগে বিহারে একটি গ্রামে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের বেশ কয়েকজন হিন্দুকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। এসব খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতন ও নির্মমতার নানা ধরনের হৃদয়স্পর্শী খবর প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ঘোলাপানি আরো ঘোলা করার জন্য এই লেখার অবতারণা নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। গুজরাটে যে মুসলিম গণহত্যা হয়ে গেল তার কোন বিচার হয়নি। এর কি জবাব দেবেন দিল্লীর ধর্মনিরপেক্ষ ব্রাহ্মণবাদী সরকার। বাবরী মসজিদ ভাঙলেন কেন আপনারা। মসজিদ না ভেঙ্গেও অযোধ্যায় একটি রামমন্দির নির্মাণ করা যেত। তাছাড়া সত্যিই কি রাম নামে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আপনারাই ভাল জানেন। ভারতে খৃস্টধর্মাবলম্বির উপর নির্যাতনও কম হচ্ছে না। তাদেরকেও হত্যা করা হচ্ছে। এসব কি মৌলবাদ থেকে উৎসারিত সাম্প্রদায়িকতা নয়!

১৯৪৪ সালের কথা। ফাল্গুন-চৈত্র মাস। কলিকাতায় গুঁটিবসন্ত দেখা দিয়েছে। আমি ও মেজভাই হাসান জামান (ডঃ হাসান জামান) বর্ধমান যাব। আম্মা নিষেধ করে দিলেন পথে কোন কিছু না খেতে। হাওড়া স্টেশনে একটি ইন্টারক্লাস বগিতে আমরা উঠে বসলাম। রবিবার, তাই ফাঁকা কামরা। এক পাশে চাদর মুড়ি দেয়া একটা লোক শুয়ে আছেন। লোকটা কাতরাচ্ছেন। বাবা গো, মা গো। ট্রেন ছেড়ে দিল। লোকটা খুবই অসুস্থ। মা, মা গো একটু জল। মেজভাই পানির বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, একটু পানি খাইয়ে দেও। এগিয়ে গেলাম। চাদর তুলে দেখি বসন্তের গোটায় তার কপাল, নাক, মুখ, ঠোঁট ভরে গেছে। ঐ অবস্থায় পানি খাইয়ে এসে আস্তে বললাম, 'পক্স'। মেজভাই বোতলটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন থামল। যতিন আছ, যতিন। দুটো লোক জানালায় মুখ বাড়িয়ে খোঁজাখুঁজি করছে। চাদর মুড়ি দেয়া লোকটি উঁ-উঁ করে উঠল। দরজায় গিয়ে আমি লোক দুটোকে ডাকলাম। দেখুন তো ইনি আপনাদের যতিন কিনা। লোক দুটো উঠে এসে দেখে বলল, হ্যাঁ এই তো। কি অবস্থা হয়েছে তোর। ধরাধরি করে তাকে দাঁড় করাল। 'দাদা আপনাদের ধন্যবাদ, জল খাইয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছেন।' মেজভাই সরল মনে বললেন, 'আল্লাহর মর্জিতে সুস্থ হয়ে যাবেন।' এইবার একসাথে ঐ তিন ব্যক্তি বলে উঠল। এ্যা, আপনারা মোচলমান। রাম, রাম, রাম। মেজভাই মৃদু হেসে আস্তে বললেন, সাম্প্রদায়িকতা আর কাকে বলে। বেচারাকে এখন গোবর খেয়ে এই অসুস্থ শরীরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বছর তের আগের কথা। ইনকিলাবের সাব এডিটর মিজানুর রহমান সাংবাদিকতায় এক মাসের প্রশিক্ষণ নিতে গেলেন বাঙ্গালোর। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে জনৈক শিক্ষকের ঘরে বসে মিজান কথা বলছিলেন। শিক্ষকের টেবিলের এক পাশে জগভর্তি পানি, দুটো গ্লাস। মিজান বলল, স্যার, পানি পিয়েঙ্গে। শিক্ষক কাউকে ডাকলেন, নাথুরাম, বাবুকো পানি পিলাও। নাথুরাম এল। বলল, আইয়ে বাবুজী। নাথুরামের পিছনে পিছনে মিজান বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঘটিভরা পানি এনে নাথুরাম বলল, পিজিয়ে বাবু। মিজানকে দুই হাত জড়ো করে (অঞ্জলী ভরে) পানি খেতে ইঙ্গিত করল নাথুরাম। গ্লাস তো দূরের কথা। ব্রাহ্মণের ঘটিতে মুখ দিয়ে ম্লেচ্ছ মুসলমান পানি খাবে কি করে। এই হল ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ। মৌলবাদ আর উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সেদেশের সমাজকে কিভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এ তার দুটো সামান্য দৃষ্টান্ত।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা- এসব মুখরোচক কথাগুলো সভা-জনসভায় ক্রমাগত বলায় বাংলাদেশী জাতি বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এই বিভক্তির ক্ষতে এতদিনে বুঝি পচন ধরে গেছে। স্বাধীনতার পর সেই যে ১৯৭২ সাল থেকে 'দালাল ধরো দালাল মারো' শুরু হয়েছে তার আর শেষ হল না। কম্বলের লোম বাছলে আর থাকে কি? যারা এসব বলেন তাদের সম্ভবত আর কিছু বলার নেই। ভাণ্ড শূন্য। শূন্য পাত্র বাজে বেশী।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। যুদ্ধ করে দেশটিকে স্বাধীন করেছে এদেশের মানুষ। আমাদের কোন শত্রু নেই। আবার জনবহুল এই ক্ষুদ্র দেশটির প্রকৃত অর্থে কোন মিত্র নেই। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশটিকে সবাই লুণ্ঠন করতে চায়। চেটে-পুটে খেতে চায়। যখন ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলবাদ,

সাম্প্রদায়িকতা এসব বলা বা লেখা হয় নিঃসন্দেহে একটি পক্ষকে উৎসাহিত করার জন্য, তাদের কূটকৌশলকে আরও শাণিত করার জন্য বলা বা লেখা হয়। ওই পক্ষটির মন পড়ে আছে দেশের বাইরে। দেশের বাইরে তাদের প্রভুরা আশীর্বাদের হাত সবসময় উঁচু করে থাকেন। কিন্তু ১৪ কোটি মানুষের এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশটিকে, এক দেশ এক জাতি পরিণত করার চিন্তা বা চেষ্টা কেউ করছেন বলে মনে হয় না। ঘৃণা দিয়ে, নিন্দা দিয়ে দেশ ও মানুষের কোন কল্যাণ করা যায় না। অন্তত মওলানা ভাসানীর মত একজন কেউ যদি থাকতেন, পল্টনের জনসভায় ধমক দিয়ে বলতেন, খামুস। তাও নেই।

আজ আমাদের এই করুণ দশা হল কেন? যারা এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যও অবগত আছেন তারা জানেন এটা অক্টোপাসরূপী রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একটি যাঁতাকল। পাতাকলও বলতে পারেন। যার কৌশল ও স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে রং বদলায়।

১৭৫৭ সালে নবাবসিরাজ উদ্দৌলার পতনের পর অসংখ্য রাজপুরুষ মুসলিম পরিবার লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হন। ধীরে ধীরে সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ বহু মুসলিম পরিবার দরিদ্র হয়ে যান। কিছু প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যে হয়নি এমন নয় কিন্তু এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লাভই হয়েছে বেশী।

১৮৫৭ সালে এল সিপাহী বিপ্লব। হিন্দু জমিদারদের কূটকৌশলে ব্যর্থ হল সে মহাবিপ্লব। ফাঁসিতে ঝুলানো হল যাদের তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। এরপর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে সহযোগিতা করা থেকে মুসলমানেরা বিরত থাকলেন। এর সুযোগ নিল হিন্দু সমাজ।

সিপাহী বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ পার্লামেন্টের হাতে নিয়ে নিলেন। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। সবাই বলল মহারাণী ভিক্টোরিয়া। এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করল হিন্দু সমাজ। বাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল। পিছিয়ে গেল। এ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন মুসলমান নৃপতি বা রাজা থাকলেও বাংলায় প্রকৃত অর্থে কোন মুসলমান নৃপতি থাকলেন না। উচ্চশিক্ষা ও উচ্চপদের প্রায় সব পদ ও চাকরি বাঙ্গালী হিন্দুদের করতলগত হল। এইবার মারাত্মকভাবে মার খেল বাংলার মুসলমান।

১৮৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হল। ঢাকায় র‍্যাংকিন স্ট্রীটের জমিদার নন্দীবাবুদের বাসভবনে বসল কংগ্রেসের এই অঞ্চলের নেতাদের প্রথম বৈঠক। ঢাকার নবাবকে সেই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সেই সময় বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সমাচার এর তীব্র নিন্দা করেছিল। তারা লিখেছিলেন ঢাকা শহরের উন্নয়নে নবাবদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাদের ডাকা হল না কেন? মুসলিম বিদ্বেষের বীজ থেকে অঙ্কুরিত সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ এই প্রথম বাংলার মাটিতে রোপণ করা হল।

১৯০৫ সালের 'বঙ্গবঙ্গ' ব্যবস্থা রদ করার জন্য তৎকালীন বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একাংশ হিন্দু নেতাদের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামলেন।